দা দা ভা ই

দাদাভাই

নাদিয়া আফরিন

মনন প্রকাশ

বিমান বন্দরের টার্মিনাল নম্বর দুই–এ অপেক্ষা করছেন সামিক হুমায়ুন। চোখে বরাবরের মতো সূর্যচশমা। পরনে নীল রঙের শার্ট। আপ্রাণ চেষ্টা নিজেকে আড়াল করবার। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চাইছেন। ড্রাইভার সালাম তাকে নিতে আসবেন। ইতোমধ্যে কথা হয়ে গেছে। সালাম ভাই বিমানবন্দরেই আছেন। অপেক্ষমাণ গাড়ির লাইনে আটকে পড়েছেন। সামিক হুমায়ুন পান্থ হুমায়ুন নামেও পরিচিত। তার ডাক নাম পান্থ। বিখ্যাত অস্কারজয়ী অভিনেতা। তিনি কিছুতেই চাইছেন না এখানে কেউ তাকে চিনতে পারুক। কিন্তু তাতে কী? মনে যা চায় তা কি আর সবসময় হয়? একে একে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতিদের ভিড় জমে গেল তাকে ঘিরে। কেউ তুলছে সেলফি, কেউ কাগজ না পেয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে অটোগ্রাফের জন্য। কাউকে কষ্ট দিতে চান না সামিক হুমায়ুন। কিন্তু এদেশে যার জন্য তার আসা হয়েছে সে কেমন আছে? ভালো আছে তো? জীবনের এতগুলো বছর পার হয়ে গেছে। আজ অস্কার বিজয়ী এই সুদর্শন অভিনেতার বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। তার মনে শুধু একটাই কথা, কেমন আছে, চৌকিদার?

ভিড় ঠেলে যাদের সাথে ছবি তুলতে পারেননি, যাদেরকে অটোগ্রাফ দিতে পারেননি তাদের সকলকে হাত দেখিয়ে হাসি মুখে বিদায় জানাতে জানাতে গাড়ির সামনে চলে এলো সামিক হুমায়ুন। সালাম ড্রাইভার সব লাগেজ গাড়ির পেছনে রাখলেন। গাড়িতে উঠে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন সামিক সাহেব।

সেই ঢাকা শহর। প্রাণের ঢাকা। একসময় অনেক কাজ করেছেন এই শহরে। জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন বাংলাদেশে প্রচুর। মানুষের মনেও তার অবস্থান খুব দৃঢ়। ভীষণ ভালোবাসেন সামিক পান্থ এই দেশটিকে। রুপালি পর্দায় তার নাম সামিক পান্থ। কত বদলে গেছে তার দেখা সেই ঢাকা। কত উন্নত হয়ে গেছে। সত্যিই ভালো লাগছে। কিন্তু কেমন আছে চৌকিদার? কেমন আছে সেই পাহারাদার? চৌকিদার? পাহারাদার? আজকালকার যুগে? একদম সঠিক। আসলে দু'জনেই এক। একই মানুষ।

কিন্তু আজ এতগুলো বছর পর যে আশার আলো নিয়ে সামিক ঢাকাতে এসেছেন সেই আশা পূর্ণ হবে তো?

দেখতে দেখতে সামিক পান্থ পৌঁছে গেলেন। তার বুক করে রাখা রিসোর্টে। হোটেল নয়, একটি রিসোর্ট বুক করে রেখেছেন সামিক পান্থ। তিনি যতদিন থাকবেন ততদিন কেউ সেই রিসোর্টে থাকতে পারবে না, আর সালাম ড্রাইভারকেও বুক করেই এসেছেন। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে একটু তাকালেন সামিক। সত্যি সুন্দর "সবুজাচল"। চারপাশে সবুজের সমারোহ। রিসোর্টের নাম সবুজাচল। দু'জন এলো সামিক পান্থকে অভ্যর্থনা জানাতেন। নিষেধ ছিল, তবুও তারা তাকে সম্মান দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। সামিক পান্থ বলেই দিলেন তিনি না ডাকলে যেন কেউ তার সাথে যোগাযোগ না করেন।

পুরো রিসোর্ট বুক করা থাকলেও সামিক উঠলেন তৃতীয় তলার ৩৬৯ নম্বর রুমে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নম্বর প্লেটের ওপর আনমনা হয়ে হাত বোলালেন তিনি। মনের ভেতরটা যেন আরও বেশি করে পাহারাদারের কথা মনে করিয়ে দিল। গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল তার। চাবি দিয়ে নিজেই দরজা খুলে ভেতরে

আসলেন। তিনি কাউকে আসতে বারণ করায় কেউ আসেনি তার সাথে। রুমের ভেতরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়লো উত্তরের বিশাল জানালাটি। সামিক দরজা বন্ধ না করেই জানালাটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুরো রিসোর্টের সৌন্দর্য এখান থেকেই দেখা যায়। একটু যেন আনমনা হয়ে গেলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন সামিক। স্পষ্ট যেন পাহারাদারের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তিনি রুমে আসার আগে তার অনুমতি নিয়েই লাগেজগুলো তার রুমে রেখে গিয়েছিল কর্মরত এক যুবক।

সামিক একটি লাগেজ তড়িঘড়ি করে খুললেন। বের করলেন একটি ফটোফ্রেম। ফ্রেমে হাত বুলিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সামিক ফ্রেমটি খাটের পাশের সাইড টেবিলে রাখলেন। কিন্তু মন মানলো না কেন যেন, তাই আবার ফ্রেমবন্দি ছবিটি লাগেজেই রেখে দিলেন।

সামিক স্নান পর্ব শেষ করে দুপুরের খাবার অর্ডার করলেন। খুব সাধারণ খাবার, তার খুব প্রিয়। ধোয়া ওঠা গরম ভাত, ঘি আর সিদ্ধ আলু। কতদিন পর সামিক তার এই প্রিয় খাবার খেলেন। অনেকের ভুল ধারণা আছে সামিক সম্পর্কে। কেউ ভাবে নাস্তিক, কেউবা ভাবে রুপালি পর্দার মানুষ। এরা কি আর ধর্ম মানে। সামিক কিন্তু ধর্মপরায়ণ একজন মানুষ। খাবার শেষে সামিক নামাজ পড়ে নিলেন। আর এতগুলো বছর যাবত এই যে তিনি একজনের জন্য নফল নামাজ পড়ছেন সেটাও পড়লেন। আজকের দিনটি তিনি আর বের হবেন না। রিসোর্টটি ঘুরে দেখতে শুরু করলেন তাই। অস্থিরচিত্ত যেন এই সবুজ গাছপালা আর চারপাশের পরিবেশের ছোঁয়ায় একটু হলেও শান্ত হলো। রিসোর্টটি আগের দিনের মতো করে তৈরি বলেই সামিক এই রিসোর্টটি বুক করে ঢাকায় এসেছে। এখানে রয়েছে ঘাট বাঁধানো একটি সুন্দর বিশাল পুকুর। সামিক ঘাটে বসে দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেললেন। কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাসে নেই দুঃখ। আছে আশা আর আলোর খেলা। শীতের দিন। ডিসেম্বর মাস, খুব ছোটো দিন। দ্রুত সন্ধ্যে নেমে এলো। সামিক মুগ্ধ হয়ে গেলেন এত বছর পর তার ছেলেবেলা ফিরে পেয়ে। ঢাকা থেকে একটু দূরে এই গাজীপুর শহরে তিনি এত বছর পর দেখতে পেলেন জোনাকি পোকা। এটা তার প্রত্যাশার বাইরে।

ছোটোবেলায় সামিক কাচের বোতলে জোনাকি পোকা ভরে রাখতেন। জোনাকিগুলো যেই বোতলে ঢুকে পড়ত তখনি বোতলের মুখ বন্ধ করে দিতেন তিনি। কী যে সুন্দর লাগত দেখতে। মা একদম করতে দিতেন না। বারণ করতেন। তবুও সামিক করতেন মাঝে মাঝে। একবার একটা কাচের বোতল ভেঙে ফেলায় মা ভীষণ জোরে চড় মেরেছিলেন। তারপর থেকে আর কোনোদিন ভালো লাগার এই কাজটি করেননি। কিছু জোনাকি ঘাটে বসে আছে। ওরা যেন সামিককে তার ছোটোবেলায়ই রেখে দিতে চাইছে। সামিকের মনে পড়ল একবার গ্রামের বাড়িতে বাড়ির সামনের বড়ো উঠোনে জোনাকি পোকার দল বসে ছিল। সামিক পা দিয়ে পিষে ফেলে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। উঠোনের ওই জায়গাটি জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল নিয়ন বাতির মতো। মা দিলেন কান মলে। দাদা এসে বাঁচালেন, দাদার কাছেই জেনেছিলাম কেন জোনাকি পোকা জ্বলে। সামিক পুরো স্মৃতি মন্থন করছেন। কেন জ্বলে এই জোনাকি? দাদা বলেছিলেন, জোনাকির দেহে থাকে লুসিফেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ। সেটাই দেহে বিক্রিয়া ঘটায়। বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিলে আলো তৈরি করে। আর এই প্রক্রিয়াটাকে বলে বায়োলুসিফেরিন (Bioluciferin)। জোনাকি পোকার পেট আর লেজের অংশে সাধারণত আলো জ্বলে। দাদা কত কিছু জানতেন। সত্যি আমাদের প্রজন্ম অনেক ভাগ্যবান। মা বাবা, দাদা, দাদি, নানা নানি, চাচা, চাচির কাছ থেকে কত কিছু শিখেছি। এসব জানবার জন্য আমাদেরকে শৈশব জলাঞ্জলি দিয়ে বাড়িতে বসে খেলার সময় টিচারের কাছে পড়তে বসতে হয়নি।

সামিক খেয়ালই করেননি স্মৃতির অতল গহ্বরে চলে গিয়ে রাত আটটা পার করে ফেলেছেন। দ্রুত রাতের খাবার খেয়ে নামাজ পড়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালেন তিনি। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে হলেও

মোবাইল নিয়ে বসতেন তিনি। কিন্তু সেসব পরিবর্তন করে দিয়েছে অভ্যেস, জীবন সম্পর্কে ধারণা; কোথায় যে সে আজ?

সকালও হয়নি। ভোর পাঁচটার পরেই সামিক রওনা হলেন মতিন সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। এখান থেকে তার বাড়ি অনেক দূর। যেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগবে। মতিন সাহেব ঠিক পৌনে সাতটার মধ্যে যেতে বলেছেন। সামিকের মনে কত প্রশ্ন? মনে মনে একটার পর একটা কথা, প্রশ্নকে সাজিয়ে চলেছেন তিনি। ঠিক যেমন সুন্দর একটি মালা খুলে আবার গাঁথা হয় সেভাবে। কারণ প্রশ্নগুলো তার মনে আগেই রেডি করে রাখা। তবুও বারবার তিনি প্রশ্নের মালাটিকে খুলছেন আর গাঁথছেন। ড্রাইভার সালাম খুব শান্ত। তাকে এভাবেই বুকিং করা। কারণ ছাড়া তার কথা বলা বারণ। সামিকের অস্থির চেহারা দেখে অনেকটা সাহস করেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন যে সামিকের শরীর ভালো আছে কি না। সামিক মৃদু হেসে হ্যাঁ সূচকভাবে মাথা নাড়লেন। আর ধন্যবাদ জানালেন।

মতিন সাহেবের বাড়িতে প্রাণঢালা অর্ভ্যথনা পেলেন সামিক। খুবই স্বাভাবিক। শীতের সকাল, অতিথি তাও আবার বিশেষ বলে কথা। কোনো ত্রুটি রাখেননি মতিন সাহেব। বেতনের টাকার অনেকটা খরচ হয়ে গেছে। তাতে কি? আমরা বাংলাদেশি না? সারা পৃথিবী জানে আমাদের মতো অতিথিপরায়ণ জাতি আর একটিও নেই। তাই একদম মধ্যবিত্ত হলেও অতিথি সেবায় থাকবে না কোনো ত্রুটি। মতিন সাহেবের মেজো মেয়ে আয়েশা সামিকের অন্ধ ভক্ত। সামিকের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে আগেই বের করে রেখেছে কী কী খেতে ভালোবাসে সামিক। একুশ রকমের পিঠার আয়োজন। এছাড়া রয়েছে খেজুরের রস। রয়েছে গাওয়া ঘি-এ ভাজা খাস্তা পরোটা। সাথে কচি পাঠার মাংসের চার রকম পদ। রুমালি রুটি, চা, কফি কোনো কিছুই বাদ নেই।

সামিক বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন পরিবারের সবার সাথে। ছবি তোলা, অটোগ্রাফ সবই হলো। মতিন সাহেব ও তার পরিবারের অতিথি আপ্যায়নে মুগ্ধ সামিক। খেজুরের রসটা খেতে পারলেন না তিনি। রস ভর্তি গ্লাসটির দিকে তাকাতেই তার বুকের ভেতরের পাঁজরের হাড়গুলো যেন ভেঙে যেতে লাগল। আর সেই ভঙ্গুর পাঁজরটা ব্যথায় কাতরে উঠল। চোখের কোণের অশ্রু নিজের সহজাত অভিনয় ক্ষমতায় আটকে রেখে কথা বলতে থাকলেন তিনি। কত বড়ো ক্ষমতা পাহারাদারের। আজ এত বছর পরও সামিক তার কথা মেনে চলেছেন। একবার রস খেয়ে ভীষণ শরীর খারাপ হয়েছিল। হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল গোটা একদিন। পাহারাদার কাঁদতে কাঁদতে সামিককে বলেছিল সে যেন আর জীবনে রস না খায়।

কাঙ্ক্ষিত সময় এলো। মতিন সাহেব ও সামিক ছাড়া রুমে এখন কেউ নেই। সামিক জানতে চাইলেন অরুণিমা সম্পর্কে। মতিন সাহেব সামিককে বললেন "কী আর বলব? ওনাকে শেষ দেখছি কবে তা তো জানেন। আপনাকে তো দাদা ফোনে সবই বলছি। আমার জানা মতে এখনো ঐখানেই আছেন উনি।"

সামিক : "এখানে আসার কথা ছিল, বলেছিলেন আপনি। আজ নয় তো কাল আসবে।"

মতিন সাহেব : তা তো ছিল দাদা। চলেন একটা জায়গায়। আপনাকে নিয়া যাই। যাবেন দাদা। এই হাঁটা পথ। তবে গাড়িতেও যেতে পারেন।"

সামিক : আমি আন্দাজ করতে পারছি। সেই মসজিদে কি?

মতিন সাহেব : জ্বি দাদা।

সামিক : অবশ্যই। চলুন। হেঁটেই যাব।

সালাম ড্রাইভারও মতিন সাহেবের বাড়িতেই সকালের নাস্তা করেছেন। সামিকের কথামতো তিনি সালাম ড্রাইভারকে সামনের মসজিদ অব্দি যেতে বললেন। মতিন সাহেব সামিককে খুব ভালো মতো খেয়াল করে বললেন, "দাদা এত অস্থির হবেন না। সন্ধান নিশ্চয়ই পাবেন, এত কষ্ট করছেন। আল্লাহ কি আর এমনি এমনি আপনাকে এইখানে নিয়া আসলেন, বলেন?" সামিক উত্তরে শুধু হ্যাঁ বললেন, আর সাথে ফেললেন দীর্ঘশ্বাস, যে দীর্ঘশ্বাসে রয়েছে অনেকটা আশাহত হবার কষ্ট আর যন্ত্রণা, আরও রয়েছে উদ্বেগ।

মসজিদে জুতো খুলে ঢুকলেন দু'জনেই। ইমাম সাহেব সামনেই ছিলেন। তাকে সালাম জানিয়ে সামিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন মতিন সাহেব। ইমাম সাহেবের সাথে পরিচয় ও সামান্য আলাপচারিতা শেষে মসজিদের ভেতরে একটি রুমে নিয়ে গেলেন সামিককে। এই রুমটি আলাদা, এত বড়ো একটি মসজিদে এই একটি রুম যেখানে কেউ প্রবেশ করেন না। অরুণিমা এলে একমাত্র সেই এই রুমে একা একা সময় কাটিয়ে যায় অনেকক্ষণ। রুমটির দরজা খোলা হলো যখন তখন যেন সামিককে কেউ টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। সামিক কিছুক্ষণ একা সময় কাটাতে চাইলে মতিন সাহেব বের হয়ে আসলেন। রুমের মধ্যে যেন সেই কথাগুলো, সেই হাসি শুনতে পারছেন তিনি। শুনতে পারছেন কান্না, এই অরুণিমার একান্ত আপন জায়গায় সামিকের মনের ভেতর কথা বলে চলেছে পাহারাদার, কী অদ্ভুত! সামিক কেঁদে ফেললেন। নিজের কান্নাকে তিনি আর সামাল দিলেন না। স্বাভাবিক হবার পর নিজেই রুম থেকে বের হয়ে মতিন সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। অজুর স্থানে গিয়ে অজু করলেন। এরপর নফল নামাজ পড়ে পুরো মসজিদটি ঘুরে দেখলেন। সেই মসজিদ, বর্ণনার সাথে হুবহু মিল। পাহারাদার বর্ণনা করেছিল কত বছর আগে। কীভাবে ঠিক সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছে মসজিদটি। অপূর্ব সুন্দর! কিন্তু অরুণিমা কি জানে যে সামিকও তৈরি করেছেন অপরূপ সুন্দর মহাদেবের মন্দির?

মতিন সাহেব : অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হইছে মেয়েটিকে দাদা। ধর্ম আলাদা। সনাতনী, সে কিনা বানাবে মসজিদ? মেয়েটা লড়াকু বটে দাদা। হাজারও বাধা অতিক্রম করে তৈরি করে এই মসজিদ। প্রথমে তো কেউ আসতই না এখানে নামাজ পড়তে। কিন্তু একটু পরেই দেখবেন এমনিতেই কত মানুষ আসবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বেশির ভাগ মানুষ এইখানেই পড়ে এখন। কিছু গোঁড়া লোকজন ছাড়া। তাদের সংখ্যা খুবই কম। আল্লাহর ঘর। আল্লাহ নিজেই সহায় হইছেন। বুঝলেন তো দাদা।

সামিক : শেষ কবে এসেছিলেন অরুণিমা এখনে?

মতিন সাহেব : নয় মাস আগে দাদা।

সামিক : আজ আসার কথা ছিল। এলেন না। কোনো ফোন করেছেন কি?

মতিন সাহেব : না, তবে আমি করছি দাদা, ফোনটা বন্ধ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ও তো এমন মেয়ে নয়। খুবই সচেতন।

সামিক : বুঝতে পেরেছে। দেখতে পেরেছে। আনমনা হয়ে কথাগুলো বলে ফেললেন সামিক।

মতিন সাহেব : কী বললেন দাদা?

সামিক : হ্যাঁ, না না কিছু না। আমাকে যেতে হবে।

মতিন সাহেব : বলেন কী? দুপুরে না খাওয়ায় ছাড়ব নাকি? খাবেন এই গরিবের বাসায়, তারপর যাবেন।

সামিক মতিন সাহেবের হাত ধরে বললেন 'ক্ষমা করবেন।' যে কাজে এসেছি সেই কাজে আগে সফল হই। তারপর দেখবেন একদিন হঠাৎ আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি। আপনাকে কিন্তু খুব জ্বালাবো মতিন ভাই। মতিন সাহেব আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন। জড়িয়ে ধরলেন সামিককে। দু'জন যেন দুই ভাই। মতিন সাহেবের দু'কাঁধে দু'হাত রেখে সামিক "আসি" বলে বিদায় নিলেন।

ড্রাইভার সালাম গাড়ি চালাচ্ছেন। গন্তব্য মতিন সাহেবের দেয়া সেই ঠিকানা। হঠাৎই সামিকের ফোন বেজে উঠল। মতিন সাহেব ফোনে বললেন "চলে গিয়া ভালোই করছেন দাদা। অরুণিমা ফোন করছিল। খুব অসুখ। কালকেও আসতে পারবে না, তবে দাদা ফোন নম্বরটা কাউকে দেওয়ার অনুমতি পাই নাই, আপনি সাবধানে যাবেন। ভালো থাকবেন দাদা।"

প্রায় বোবা এমন একজন মানুষ সালাম ড্রাইভার। তবুও বললেন,

স্যার এখানকার কলা খুব ভালো, কিনব? খাবেন? সামিক "না" বলায় ড্রাইভার আর গাড়ি থামালেন না। অরুণিমা ঠিক কতটুকু অসুস্থ? কে আছে এখন ওর পাশে? কী করছে? ও কি এখনো কোমরের ব্যথায় খুব ভোগে? হাড়ের অবস্থা কী ওর? চিকিৎসা করিয়েছে তো? মোবাইলে অরুণিমার ছবিগুলো দেখতে দেখতে সামিক এসবই ভেবে চলেছেন। সামিক কাঁদছেন। সালাম ড্রাইভার দেখলেন কি না দেখলেন তাতে তার কিছু যায় আসে না। অরুণিমার ছবিতে হাত বোলাচ্ছেন তিনি, আর মনে মনে বলছেন "একবার ডাক আমায়। ডাক না? ডাকবি না তো? আচ্ছা ডাকতে হবে না। আমি আসছি তোর কাছে। দেখি কত বছর আড়াল করে রাখবি তুই নিজেকে? কী ভাবিস তুই নিজেকে?"

ঘড়িতে রাত ১০টা ৩২ মিনিট। পৌঁছে গেলেন সেই ঠিকানায়। ইতোমধ্যে সালাম ড্রাইভার লাঞ্চ, ডিনার সেরে নিয়েছে। সামিক খাননি কিছুই। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তড়িঘড়ি করে গাড়ি থেকে নামলেন। একটি এক তলা বাড়ি। সামনে এক চিলতে জায়গা। বাড়ির ডান পাশেই রয়েছে একটি পেয়ারা গাছ। বাম দিকে একটি আম গাছ। লাইট জ্বলছে। সামিক একটি গ্রিল দরজায় কড়া নাড়লেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, কেউই বের হলো না। এদিকে রাতও হয়ে গেছে। কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না সামিক। সালাম ড্রাইভার নেমে এসে বললেন "স্যার মনে হয় না কেউ জেগে আছে। থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আসতেন। সামনে পার্কিং এর জায়গা আছে। আপনি কি গাড়িতে অপেক্ষা করবেন। কোনো ফোন নম্বর নেই স্যার? আর স্যার এত কথা বলতাম না। কিন্তু আপনি সারাদিন কিছু খাননি। আমাকে তো রিসোর্ট থেকে ফোন করেছিল। আপনার খোঁজ নিয়েছেন স্যার। আর আমাকে অন্তত এইটুকু কথা বলতে বলা হয়েছে।" সামিক, সালাম ড্রাইভারকে বললেন, 'ধন্যবাদ, সরি বলার কী আছে সালাম ভাই? আমার কাছে ফোন নম্বর নেই। কিন্তু ঠিকানা এটাই। চলুন গাড়িতেই রাতটা পার করে দিই।" সালাম ড্রাইভার বললেন "আমাকে আপনি ভাই বললেন স্যার? আপনি কত বিখ্যাত মানুষ, আর আমাকে আপনি ভাই ডাকলেন? সরি স্যার।"

সামিক : ওমা! আমাকে সরি বলছেন কেন?

সালাম : স্যার আপনাকে মানুষ খুব পছন্দ করে। আমাদের দেশের মানুষ আপনাকে পারলে মাথায় করে রাখে। কিন্তু আমি সব সময় আপনার বিরুদ্ধাচারণ করি। আপনার অভিনয় এত ভালো কিন্তু তবুও অনেক অনেক খুঁত ধরি।

সামিক: এটা তো স্বাভাবিক। আপনি আমার অভিনয় দেখেন। এটা শুনেই আমি খুব খুশি।

সালাম : না স্যার। আপনার অভিনয়ের খুঁত ধরি অন্য কারণে। সবাই যখন বলে কতই না সুন্দর আপনার চেহারা। তখনো আমি বলি কি এমন দেখতে।

সামিক : সবার যে সবার চেহারা পছন্দ হবে তার কি মানে আছে। আমার কিন্তু আপনার চেহারা খুব ভালো লেগেছে সালাম ভাই। একি কাঁদছেন কেন?

সালাম : স্যার, শুনেছি এবং টিভিতেও দেখেছি আপনি একটি অনেক বড়ো শিব মন্দির তৈরি করেছেন। একজন মুসলমান হয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মন্দির তৈরি করেছেন। এই কারণেই রাগ ছিল স্যার। ক্ষমা করবেন স্যার আমাকে।

সামিক : স্যার না, প্লিজ আমাকে ভাই ডাকুন বা দাদা। যেটা আপনার খুশি। আর সরি বলার কী আছে? খুব স্বাভাবিক। আমার দেশের অনেকেই আমাকে এ কারণে পছন্দ করে না। আমি জানি। চলুন ভাই গাড়িতে গিয়ে বসি।

সালাম : স্যার আজ ওই গ্রামে এত সুন্দর আর এত বড়ো মসজিদ দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। শুনলাম মসজিদটি একটি হিন্দু মেয়ে তৈরি করেছে। জানেন স্যার জীবনের সব হিসাব কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে।

সামিক আর সালাম গাড়িতে উঠলেন, পার্কিং-এ গাড়ি রাখলেন।

সামিক : সালাম ভাই আপনার কথায় কিন্তু এ দেশের টান নেই।

সালাম : ও আচ্ছা দাদা। ভালোই আছে। কমু নাকি আমাগো ভাষায় কথা। আমাগো গেরামের ভাষা।

সামিক হাসতে হাসতে বললেন "ধন্যবাদ সালাম ভাই। আপনি হাসালেন আমাকে। ভারি মিষ্টি ভাষা। আমি এশার নামাজ পড়ে ঘুমোব। রাস্তাতেই নামাজ পড়ে নিলেন সামিক।

সকাল আটটা বেজে দশ মিনিট। অবশেষে বাড়ি থেকে একজন মহিলা বের হচ্ছেন। দ্রুত সামিক বের হয়ে এলেন। চোখে সান গ্লাস। মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সামিক।

মহিলা : আপনি? আপনারে কোথায় যেন দেখছি।

সামিক : নমস্কার, দিদি এটা কি অরুণিমা সেনগুপ্ত'র বাড়ি? আমি ওনার সাথে দেখা করতে এসেছি।

মহিলা : নমস্কার, অরুণিমা তো খুব অসুস্থ। এখানে ও এখন থাকে না। আমি বাড়িটা দেখাশোনা করি।

সামিক : অরুণিমা কোথায় থাকেন। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। খুব দরকার ওনার সাথে।

মহিলা : কোথায় থাকে জানি না। আপনি কে বলেন তো? খুব চেনা চেনা লাগতেসে।

সামিক : হয়তো কোথাও দেখেছেন। আপনি কি সত্যি জানেন না অরুণিমা কোথায় থাকেন? ও অসুস্থ। সেটা জানি। আমাকে ওর সাথে দেখা করতেই হবে। প্লিজ দিদি হেল্প মি। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন ও কোথায় আছে। প্লিজ ঠিকানাটা দিন।

মহিলা : কী কাণ্ড। আরে মহা ঝামেলায় পড়লাম সাত সকালে। আপনার পরিচয়টা তো জানি না। ক্যামনে বলি, বলেন তো। আপনিই বলেন। আপনি হইলে কী করতেন?

সামিক : দিদি আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাকে হেল্প করতেই হবে। সামিক হাত জোড় করে মহিলার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন।

মহিলা : আরে আরে কী করেন। আচ্ছা ওঠেন। আপনি ওঠেন তো।

সামিক উঠে দাঁড়ালেন।

মহিলা : দেখে তো মনে হইতেছে আপনি অরুণিমার খুব কাছের কেউ। কিন্তু আপনারে তো কোনোদিনও ওর এই বাড়িতে আসতে দেখি নাই। ওর মুখে আপনের মতো কারও কথাও তো শুনি নাই। শোনেন। ওর এক কাকা আছে। ওইখানে আছে আপাতত।

সামিক : অরুণিমার কাকা!

মহিলা : এত অবাক হইবার কী আছে। কাকা থাকতে পারে না?

সামিক : ঠিকানা ছাড়া কীভাবে ওর কাকার বাড়ি যাব!

মহিলা : দেখেন, এর বেশি কিছুই বলার নাই। এতই যদি ওর কাছের মানুষ হন তাইলে নিজে খুঁইজা বাইর করেন। গুপ্তধন অনেক সময় ঘরেই থাকে। আর মানুষ দুনিয়া খুঁইজা বেড়ায়। আপনি এখন যান। এত কষ্ট করছেন। কেষ্ট ঠিক মিলব। কাকার বাড়ি খুঁইজা বাইর করেন। একজন কাকাই আছে অরুণিমার। অসুস্থ মেয়ে। কে দেখবো। তাই ওইখানেই থাকে। আসেন আপনি।

সামিক : ধন্যবাদ, এই কার্ডটি রাখুন। এখানে আমার ফোন নম্বর আছে। কখনো এই বাড়িতে আসলে দয়া করে আমাকে একটা ফোন করবেন। আসি দিদি।

সামিক গাড়িতে উঠলেন। কোথায় যাবে জানতে চাইলে সালামকে বললেন গাড়িটা নিয়ে একটু ঘুরে নিন, আসলে কী করব আমি বুঝতে পারছি না।

গাড়ি নিয়ে অনেকটা সময় ঘুরবার পর সালামকে সামিক সবুজাচলে ফিরে যেতে বললেন।

সালাম : দাদা আপনি সেই কালকে কখন থেকে না খাওয়া। কিছুই কি খাবেন না? সবুজাচলে পৌঁছাতে তো রাত ১টা বেজে যাবে। সামনে একটা খুব ভালো রেস্তোরাঁ আছে। আপনি দোতলার ভিআইপি কেবিনে বসে খাবেন দাদা। কেউ ডিস্টার্ব করবে না, আর এই ব্যাপারটা আমিও দেখব।

সামিক : চলুন, তবে আপনাকেও আমার সাথে বসে খেতে হবে সালাম ভাই। নইলে খাব না।

সামিককে সালাম 'বিরতি' নামক একটি খুব সুন্দর রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। যদিও সামিকের মতো মানুষের কাছে এটাও ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট এর মতো। অর্থাৎ রাস্তার পারে ইটের ওপর বসে ভাজা ভুজি খায় আর হেসে হেসে বলে ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে খাইলাম। অনেক রকমের খাবারই মানুষ খায় এমন ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে। এইসব কথা শুনে সামিক মৃদু হেসে বললেন ফিরে যাবার আগে একবার আপনার সাথে বসে খাব সালাম ভাই। শুনেই খেতে ইচ্ছে করছে।

সালাম : লজ্জা দিবেন না দাদা। আপনি ইটের ওপর বসে খাবেন?

সামিক : অনেক আগে কিন্তু আমি ঢাকায় এসেছিলাম। কাজও করেছি। আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি বলেই একের পর এক কাজ করতে পেরেছি।

অর্ডার করা খাবার চলে এলো। খিচুড়ি আর মাটন কষা। ডিম ভুনা। দু'জনেই তৃপ্তি করে খেলেন। সালাম খেয়াল করলেন সামিক খিদের জন্য খাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু তার কপালের ভাঁজ বলে দিচ্ছে ভীষণ চিন্তায় আছে। তিনি খেতে খেতেই মতিন সাহেবের ফোন এলো। সামিক খুব উৎসাহ নিয়ে ফোন ধরলেন। হয়তো অরুণিমার কোনো খবর। কিন্তু আশাহত হলেন, মতিন সাহেব অরুণিমার কাকার কথা শুনে কিছুই বলতে পারলেন না। উল্টো তিনিই খোঁজ নিতে ফোন করেছেন যে অরুণিমা কেমন আছে। কারণ ওর ফোন সুইচড অফ। কথা বলার সময় সালাম স্বাভাবিকভাবেই সব শুনলেও খুব একটা বুঝতে পারলেন না। আর তাছাড়া এ বিষয়ে সামিককে তার প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। "বিরতি" থেকে বের হয়ে সামিক গাড়িতে উঠলেন। কোনোদিন তিনি এত অসহায় বোধ করেননি। এতগুলো বছর পর ঢাকা আসাটা কি তবে বৃথা হবে? মোবাইলে একের পর এক অনেক ছবি দেখছেন সামিক। এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল অনেক

পরে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত ৮টা ৪ মিনিট। অনেকটা ফ্রেশ অনুভব করছেন এবার। কিন্তু সময় তাকে মনে করিয়ে দিল সালাম এতক্ষণ কিছু খায়নি।

সামিক : সালাম ভাই, আপনি খেয়েছেন? খাননি কিছু সেই সকালের পর তাই না? কারণ গাড়ি থামলে আমি টের পেতাম।

সালাম : দাদা সকালে এত পেট ভরে খেলাম। এখনো খিদা পায়নি। আপনি কিছু খাবেন?

সামিক : না না। খিদে নেই একদম, আমারও পেট ভরা।

সামিক একটা মেডিটেশনার মিউজিক শুনতে শুরু করলেন। খুব ভালো লাগছে তার। সেই কত বছর আগে পাহারাদার তাকে এই মিউজিকটা শুনতে বলেছিল। আজ মিউজিকটা শুনতে শুনতে সামিক বন্ধ করে দিলেন। ভাবছেন অরুণিমাকে না পেলে পাহারাদারকেই বা কীভাবে পাবেন তিনি।

গাড়ি অনেক আগেই সবুজাচলে ঢুকে গেছে। রাস্তায় কোনো যানজট ছিল না। রাত ১১টা বেজে ১১ মিনিটে সামিক নিজের রুমে ঢুকে গেলেন। ফ্রেশ হয়ে, পোশাক পরিবর্তন করে নামাজ পড়ে নিলেন। কাজা নামাজ। রাতেও খেলেন না। অরুণিমার কাকা সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি। এভাবে কেমন করে খুঁজে পাবে অরুণিমাকে?

কে এই অরুণিমা? কীভাবে পরিচয় অরুণিমার সেনগুপ্ত-এর সাথে সামিক পান্থ'র?

অরুণিমা মোবাইল ব্রাউজ করছেন। সোশ্যালমিডিয়াতে তার একটিই কাজ। তার অনলাইন ব্যবসাগুলোকে ভালোমতো চালানো। খুব পরিশ্রমী মেয়ে অরুণিমা। একজন ভালো পেশাদার উদার ও নরম মনের ব্যবসায়ী ও একাধারে একজন ডাক্তার। অরুণিমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আর তেমন কোনো কাজ নেই বললেই চলে। কারও সাথে চ্যাটও করেন না। সেই সময়ও নেই। আর সময় থাকলেও তার বন্ধু তালিকায় এমন কেউ নেই যার সাথে তিনি দু'টো কথা বলবেন। তবে হ্যাঁ রয়েছে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী। যারা বন্ধু তালিকার বাইরে থেকেও অরুণিমাকে ফলো করে তার ব্যতিক্রমী, সুন্দর কর্মকাণ্ড ও ভ্রমণ সংক্রান্ত পোস্টগুলোর জন্য। ভালোবাসে অরুণিমাকে। ভালোবেসে কালেভদ্রে তিনি যে ভিডিওগুলোতে নিজের চিন্তাধারা তুলে ধরেন তার বলা কথার মাধ্যমে সেইগুলো দেখতে। আর অদ্ভুত আধ্যাত্মিক কিছু কথা লেখেন তিনি। অনেক মানুষ সেই লেখনীর মধ্যে খুঁজে পান জীবনের সংজ্ঞা।

আজকের মতো এতগুলো বিজনেস পেইজ মনিটর করা শেষ। একটু পরেই ধ্যানে বসবেন অরুণিমা। খুব ভালোবাসেন ধ্যান করতে। পরম শান্তি মেলে মনে। সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট করার আগেই একটু ঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে হলো আজ অরুণিমার অন্যদের পোস্ট। কিছুক্ষণ পরই উৎসাহ হারিয়ে হোম পেইজে চলে এলেন তিনি। ওখানে অনেককেই দেখানো হয় যাদেরকে চাইলেই বন্ধুত্বের অনুরোধ অর্থাৎ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো যায়। হঠাৎ এমন একজনের অ্যাকাউন্ট নজর কাড়লো অরুণিমার যিনি রূপোলি পর্দার একজন মানুষ। তাও অন্যদেশের, প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সেই কত ছোটো বয়স থেকে অরুণিমা এই ভদ্রলোকের অন্ধ ভক্ত। একদম স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করলেন আজ অরুণিমা। নিজের অজান্তেই ভদ্রলোকের প্রোফাইলে ঢুঁ মারলেন। ভ্রমণ করলেন স্বপ্নালোকে। কিন্তু স্বপ্নালোকের মানুষরা স্বপ্নের মতোই হয়। তারা কখনই বন্ধু হতে পারে না। বিশেষ করে অরুণিমাদের মতো চরম অন্তর্মুখী মানুষদের তো নয়ই। স্বপ্নালোক সম প্রোফাইলটি থেকে বের হবার সময় অরুণিমার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেঁপে বন্ধুত্বের অনরোধ চলে গেল মানুষটির কাছে। মানুষটি আর কেউ নয়। সামিক পান্থ। অরুণিমা হাসলেন। এরকম হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে সামিক পান্থ'র কাছে বন্ধুত্বের অনুরোধ যায় এই ভার্চুয়াল জগতে। কিন্তু তিনি কি আর সেগুলোকে

পাত্তা দেন। সকালে চেম্বারে যেতে হবে। তার আগে একটু ধ্যান করে নিয়ে ঘুমোতে যাবেন অরুণিমা। অরুণিমার তার সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে কিছু লিখতে ইচ্ছে হলো। তিনি একটু ভেবে লিখলেন –

"খেয়াঘাটে ভিড়ছে তরী–
পার হবি কে আয়।
খেয়ায় মাঝি ডাকছে তোরে
আজ এ অবেলায়।
দিবস এখন বিদায় নিল,
সন্ধ্যে এলো বলে।
খেয়ার ঘাটে ভিড় লেগেছে
যাত্রী দলে দলে।
আঁধার যদি নেমে আসে,
পথ পাবি না খুঁজে!
থাকবে আলো পার হয়ে যা'
থাকিস না চোখ বুজে'

সকালে বাড়ির মানুষগুলোর সব খোঁজ খবর নিয়ে অরুণিমা বের হয়ে গেলেন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। রাজধানী ঢাকার অত্যন্ত বিখ্যাত একটি প্রাইভেট হাসপাতালের হৃদরোগের ডাক্তার তিনি। বয়স পঁয়ত্রিশ। গাড়ির এসি বন্ধ করে দিল ড্রাইভার অরুণিমার কথায়। কী সুন্দর প্রকৃতির হাওয়া। অরুণিমার মনটাও খুব ভালো রয়েছে। সকালে রোজ হাঁটেন ও ব্যায়াম করেন তিনি। তার আগে ঘুম থেকে উঠেই ধ্যান করেন। আজ ধ্যান করার সময় একটা অদ্ভুত আলো যেন ঘুরছিল অরুণিমার চারপাশে। চোখ বন্ধ থাকলেও সেই আলোর অপূর্ব সৌন্দর্য অরুণিমা যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। একসময় আলোটি যেন অরুণিমার ভেতরে ঢুকে গেল। অরুণিমার মনে হচ্ছে গত উনিশ বছর যাবত যে জিনিসটি তিনি খুঁজে চলেছেন তা যেন তার খুব কাছে চলে এসেছে।

হাসপাতালে পৌঁছে রোজকার মতো বাড়িতে জানালেন অরুণিমা। সকালের রাউন্ড শেষ করে মনটা আরও ভালো হয়ে গেল। ছয় নম্বর কেবিনের রোগী একদম ভালো হয়ে গেছে। তবুও চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখে আজ তিনি ডিসচার্জ লেটার লিখে দিয়েছেন। সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। এখন একটু কফি আর স্যান্ডউইচ খাবেন তিনি। খেতে খেতে সোস্যাল মিডিয়াতে ঢুকলেন ব্যবসার পেইজগুলো একটু দেখে নেবার জন্য। ঢুকেই খুব অবাক হলেন। সামিক পান্থ তার অনেকটা ভুল করে পাঠানো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেছেন। অরুণিমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এত বড়ো আন্তর্জাতিক মানের তারকা সত্যি সত্যিই তার রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করলেন! অরুণিমা ম্যাসেঞ্জারে ঢুকে সামিক পান্থকে লিখলেন "আমার ভুল করে পাঠানো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটি একসেপ্ট করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।"

সারাদিন কেটে গেল। রাতও হয়ে গেছে। অরুণিমার ডিউটি শেষ, অরুণিমা চরম অন্তমুর্খী অর্থাৎ এক্সট্রিম ইনট্রোভার্ট মানুষ হলেও রোগীদের সাথে সব সময় খুব হাসি মুখে কথা বলেন। একটু মেশার চেষ্টা করেন তাদের সাথে। কারণ অরুণিমা জানেন শুধু পথ্য নয় মানসিক জোর একজন রোগীকে খুব দ্রুত সারিয়ে তোলে। তাই অরুণিমা সমাজ ও পরিবারের মানুষের কাছে অহংকারী হলেও তার রোগীদের কাছে খুবই প্রিয় মানুষ। অহংকারবিহীন একজন মানুষ। একজন অপরাজিত চিকিৎসক। এই বয়সেই অরুণিমা যে খ্যাতি

অর্জন করেছেন, যে সাফল্য পেয়েছেন তা খুবই নজরকাড়া এবং খুবই ঈর্ষণীয়। সব রোগীর সাথে কথা বলে বাড়ি ফিরে এলো অরুণিমা। বাড়িতে তাকে আবার বকা শুনতে হলো ঢাকার রাস্তার ট্রাফিক জ্যামও বোধ হয় অরুণিমাই তৈরি করেছেন। শান্ত স্বভাবের অরুণিমা কিছুই বললেন না তার বড়ো পিসিকে। পরিবারে তারা তিনজন মানুষ। অরুণিমা সেনগুপ্ত, বড়ো পিসি মালবিকা রায়, আর ছোটো পিসি তমালিকা মিত্র।

দুই পিসিই বিধবা। খুব কম বয়সেই দুই বোন স্বামী হারা হয়েছেন। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করার কথা ভাবেননি তারা। অরুণিমা অনাথ। অনাথ আশ্রম থেকে এনেই সন্তানহারা দু'জন বিধবা মানুষ করেছেন এই অরুণিমাকে। অরুণিমার কাছে তাই তার দুই পিসি হলো ভগবান। কোনোদিন অরুণিমা তাদের ওপর কোনো কথা বলেন না। একবার বলেছিলেন, শোনেননি তারা অরুণিমার কথা। তাতে অরুণিমার জীবনে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে এলেও অরুণিমা তাদের কোনোদিন দোষারোপ করেননি। অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনে নিজেদের শখে অরুণিমাকে তারা বড়ো করে তুলেছেন। পড়ালেখা শিখিয়ে ডাক্তার তৈরি করেছেন। আর কী চাই।

রাতের খাবার খেয়ে অরুণিমা বসলেন তার বিজনেস পেইজগুলো মনিটর করতে। হঠাৎ ম্যাসেঞ্জারে উত্তর এলো সামিক পান্থ এর কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন "মোস্ট ওয়েলকাম। আপনিও ভালো থাকবেন।" এছাড়া গত রাতে লেখা পোস্টটিতেও লাইক রিয়্যাকশন দিয়েছেন তিনি। অরুণিমা সামিককে ম্যাসেঞ্জারে লিখলেন "ধন্যবাদ আবারও, আমার লেখা পোস্টটি লাইক করার জন্য। আপনি এত বড়ো সেলিব্রেটি হয়ে আমার মতো সাধারণ মানুষের সাধারণ লেখা লাইক করেছেন। এটা আমার জন্য একটা প্রাপ্তি। বিশাল প্রাপ্তি।" এরপর বিজনেস পেইজগুলো মনিটর করে সবদিক সামলে ধ্যানে বসলেন অরুণিমা। ধ্যান অরুণিমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ধ্যানহীন জীবন তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। আবার সেই, অদ্ভুত আলোর অনুভূতি। যেন ঐশ্বরিক ছোঁয়া। ধ্যান শেষে ঠাকুর প্রণাম করে ঘুমিয়ে পড়লেন অরুণিমা। কাল ডিউটি নেই অরুণিমার। সপ্তাহে এই একটি দিন তার 'অফ ডে'। বৃহস্পতিবার। তবে এমার্জেন্সি থাকলে যেতে হয়।

সকালটা ভারি সুন্দর। স্নিগ্ধতা আর মুগ্ধতা মিলেমিশে একাকার। সব কাজ সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে পুজো করে অরুণিমা বের হলেন তার বিভিন্ন কারখানা ভিজিট করতে। বের হবার আগেও রোগীদের খোঁজ নিয়েছেন তিনি ফোন করে। এখন অরুণিমা নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছেন। সেখানে জামদানি পল্লিতে রয়েছে তার নিজস্ব তিনটি তাঁত। এছাড়া ওখানকার একজন দুঃস্থ ভদ্রমহিলা তাকে সাপ্লাই দেয় হাতে তৈরি করা কেক। যা ওখানে ও ঢাকায় দুই জায়গাতেই সমানভাবে চাহিদাসম্পন্ন।

জামদানি পল্লিতে কাজ শেষ অরুণিমার। সব কাজ ঠিকঠাক মতো চলছে। দুপুরের খাবার বাসেদ চাচার বাড়িতে খাচ্ছেন। ভাত আর মুরগির মাংস। বাসেদ চাচা একজন অসাধারণ মেধা সম্পন্ন গুণী তাঁতি। বাসেদ চাচার স্ত্রী রাশেদা চাচিও তাই। রান্না তিনিই করেছেন। অরুণিমাকে খুব স্নেহ করেন। মানুষের স্নেহ ভালোবাসা, সম্মান পাবার মতন মানুষই অরুণিমা। খাবার শেষে রাশেদা চাচির সাথে কথা বলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন অরুণিমা। ঠিক তখনই তার ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ এলো সামিক পান্থ'র। তিনি লিখেছেন। "মাই প্লেজার, আপনার লেখাটি সুন্দর। লাইক এমনি এমনি করিনি। এছাড়া আপনার কিছু ভিডিও নজর কাড়ার মতো। ঈশ্বরকে নিয়ে অনেক কিছু বলেন আপনি। আবার কিছু কথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অনেক গভীরতা, আধ্যাত্মিক, আমার খুব ভাল লেগেছে। কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি মানুষের মুখ দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। ভালো থাকবেন।"

সামিকের এত বড়ো ম্যাসেজ পেয়ে অরুণিমা পুরো অবাক। সামিক তার স্বপ্ন পুরুষ। কিন্তু একবার একটি সাক্ষাৎকারে সামিক পান্থকে যখন অহংকারী বলা হয়। তখন তিনি বলেন "আমি আসলে এক্সট্রিম ইনট্রোভার্ট

মানুষ অর্থাৎ চরম অন্তমুর্খী। মানুষের সাথে মিশতে পারি না। কথা খুব কম বলি। তাই সবাই অহংকারীভাবে। এখন মানুষের ভাবনার ওপর তো আমার কোনো হাত নেই।" অরুণিমা এই কারণেই অবাক হয়ে গেলেন। এত এক্সট্রিম ইনট্রোভার্ট একজন মানুষ অরুণিমার মতো সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকে এতগুলো কথা লিখেছেন। তাহলে সাক্ষাৎকারে বলা কথাগুলোই সত্য। সামিক পান্থ আসলে অহংকারী নন। অরুণিমা ভাবছেন কী উত্তর দেয়া উচিত। অবশেষে এতকিছু না ভেবে অরুণিমা সামিককে লিখে পাঠালেন "ধন্যবাদ।" আর কিছু লিখলেন না অরুণিমা। একটু বিশ্রাম নিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি গেলেন আয়েশা খালার বাড়িতে।

গত দু'বছর আগেও আয়েশা খালা ভাবতে পারছিলেন না দুই বাচ্চা নিয়ে স্বামীহারা হয়ে কীভাবে সংসার চালাবেন। তখনই অনলাইনে পরিচয় হয় আয়েশা খালার সাথে। আয়েশা খালা এত রকমের কেক বানাতে পারেন যা অকল্পনীয়। কিন্তু কোনোদিন এইটাই যে তার রোজগারের পথ হতে পারে তা ভাবতে পারেননি। অরুণিমা আয়েশা খালার জীবনে সাঁঝের বাতি। তার অন্ধকার জীবনটাকে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছেন এই অরুণিমা মেয়েটি। কেকের ব্যবসা খুব ভালো চলছে। আয়েশা খালা অরুণিমার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আয়েশা খালাকে কেকের কিছু সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যাধুনিক আঙ্গিকের ছাঁচ দিয়ে গেলেন অরুণিমা। ইতোমধ্যে বাড়িতে খোঁজ নিয়েছেন অরুণিমা। বড়ো আর ছোটো পিসি দু'জনেই ভালো আছেন।

অরুণিমা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। সামিকের ম্যাসেজটির কথা মনে পড়লো তার। শুধু ধন্যবাদ লেখাটি কি ঠিক হলো? এত বড়ো তারকা? অরুণিমা ম্যাসেঞ্জারে সামিকের সাথে তার ছোট্ট দু'তিন লাইনের ম্যাসেজগুলো দেখতে শুরু করলেন। অদ্ভুত সেই অনুভূতি আবার হলো। সেই অদৃশ্য আলোটি যেন অরুণিমার হৃদয়ের একদম মাঝখানে ঢুকে গেল। ফিরতে ফিরতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। যথারীতি বকা শুনতে হলো পিসিদের কাছে। আদরের বকা, রাতে আর কিছু খেলেন না আজ অরুণিমা। সেই অদ্ভুত আলোর অনুভূতি আর গত উনিশ বছর ধরে যে কষ্ট তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। জীবন থেকে উনিশ বছর কেটে গেল। কিন্তু কোনো উত্তর মিলল না সেই অনুভূতির। কত জায়গায় খুঁজবেন জিনিসটিকে অরুণিমা? উনিশ বছর যাবৎ কি খুঁজছেন অরুণিমা?

অরুণিমা যেদিন পনেরো বছর পার করে ষোলো বছরে পা রাখলেন, সেদিন কত কি আয়োজন করা হয়েছিল অরুণিমার জন্য। অরুণিমার জন্মদিন। ক্ষীর, পায়েস, পাটিসাপটা পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধ চিতই পিঠা, মরোগশংসা পিঠা, কুলি পিঠা, খেজুরের হালুয়া, ছোলার ডালের হালুয়া। সব ছিল সকালে। এই সব কিছু বড়ো পিসি নিজে হাতে তৈরি করেছেন। কী যে মজা খেতে। বড়ো পিসি এসব তৈরিতে পটু। ছোটো পিসি দুপুর, বিকেল আর রাতের খাবার তৈরি করেছিলেন। এলাহি ব্যাপার ছিল সে এক। বিন্তি বলে একটি মেয়ের সাথে স্কুলে কিছুটা কথা হতো অরুণিমার। এছাড়া অরুণিমার কখনই কোনো বন্ধু বা বান্ধবী ছিল না। তার ইনট্রোভার্ট স্বভাবের জন্য তিনি মিশতে পারেন না। কিন্তু বিন্তির সাথে কথা হয়। পড়ালেখা নিয়েই কথা। বিন্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ওর বাড়ির লোকজন সমেত। সেদিনটা ভাবলে এখনো অরুণিমার গা শিহরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যের পরেই বিন্তি ওর বাবা, মা আর ছোটো দুই ভাইকে নিয়ে আসে অরুণিমার বাড়িতে। কী সুন্দর একটা শোপিচ আর অরুণিমার প্রিয় লেখকের নতুন গল্পের বই রঙিন কাগজে মুড়ে নিয়ে এসেছিল।

অরুণিমার কাছে বিন্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এই একজন মানুষই আছে স্কুলে যে অরুণিমার সাথে কথা বলে। অরুণিমাকে অহংকারী ভাবে না। বলে না যে তুই তো আসলে অনাথ। তোর পিসিরা তো তোর আপন পিসি নয়। এ কথাগুলো সালমা জানিয়েছিল স্কুলে। সালমার চাচি অরুণিমাদের বাড়ির পাশেই থাকে। এসব কথা শুনতে কারই বা ভালো লাগে? কিন্তু বিন্তি কোনোদিন এসব কথা বলেনি। তাই, খুব স্বল্প কথা হলেও অরুণিমার কাছে বিন্তি একজন ভালো বন্ধু। সেদিন অরুণিমার জন্মদিনের রাতে ভীষণ ভোজের আয়োজন।

কব্জি ডুবিয়ে খেয়েছে সবাই। বিন্তিরা সবাই ছোটো পিসির রান্নার খুব প্রশংসা করছিল। বড়ো পিসিও হেরে যায়নি। তার বানানো সব পদ খাওয়া সম্ভব না হলেও প্রশংসার অন্ত নেই। খুব ভালো লাগছে অরুণিমার। বড়োরা এক সাথে কথা বলছেন। আর অরুণিমা, বিন্তি আর বিন্তির দুই ভাই একসাথে লুডু খেলতে বসলেন। খুব সুন্দর সময় কাটছিল। হঠাৎ করেই ছোটো পিসি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই রাতে বিন্তিরাই সব সাহায্য করেছিল। পিসিকে হাসপাতাল ভর্তি করতে সাহায্য করেছিলেন বিন্তির বাবা ও মা। টানা সাতদিন ছোটো পিসিকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। রোজ আসতেন বিন্তির বাবা, মা ও বিন্তি দেখা করতে। সেই থেকে বিন্তির প্রতি অরুণিমার ভালোলাগাটা আরও বেশি বেড়ে যায়। অরুণিমা চিরকাল বিন্তিকে মনের গভীরে রাখবে এটাই, ভেবেছিল। রেখেছেও। কিন্তু সবাই তো আর অরুণিমার মতো নরম মনের নয়।

পরবর্তীতে বিন্তি অযথাই একটি বিষয়ে ভুল বোঝে অরুণিমাকে। দীর্ঘদিন ছোটো পিসির চিকিৎসা হবার পর ছোটো পিসিকে নিয়ে বড়ো পিসির সঙ্গে অরুণিমা যায় কলকাতা শহরে। ওখানে রুবি মেডিকেল হাসপাতালে ছোটো পিসির অপারেশন হয়। পিসির চিকিৎসার জন্য গেলেও পিসিকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করার পর তারা কলকাতা শহর ঘুরে কিছুটা। পুরনো শহরটার মধ্যে কী যেন একটা আছে বলে মনে হয় অরুণিমার। সেটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। অরুণিমার মনে হতে থাকে এই শহরে এমন একটা জিনিস আছে যেটা একান্তই তার, শুধু তার। আর কারো নয়। কিন্তু সেই জিনিসটি ঠিক কী তা বুঝে উঠতে পারেন না অরুণিমা। তার এই অনুভূতি এতটাই প্রবল হয় সেই শহরে থাকতেই যা অকল্পনীয়। ঘুরবার পাশাপাশি অরুণিমা বড়ো পিসি আর ছোটো পিসির সাথে গড়িয়াহাট বলে একটি জায়গায় কেনাকাটা করতে যায়। কোনোকিছুতেই মন নেই তার। এমনকি বিন্তিকে আইএসডি ফোন করে কথা বলার সময় বিন্তি যে দু'টো জিনিস তার জন্য নিয়ে আসতে বলে সেটাও ভুলে যায় অরুণিমা। বড়ো পিসি বিন্তিদের সবার জন্য উপহার কেনেন। দেশে ফিরে কী অপার শান্তি। নিজের দেশ বলে কথা। দেশের মাটিতে পা রাখতেই মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। ছোটো পিসিও সুস্থ আছেন। মন তাই বেশ ভালো। কিন্তু কী ফেলে এলেন অরুণিমা ঐ কলকাতা শহরটাতে। ওখানে কিইবা থাকতে পারে? কোথায় এত কিছু কেনাকাটা করলেন। বেশ কয়েকটা জায়গা ঘুরে দেখলেন অথচ এমন কিছু তো কোথাও পেলেন না অরুণিমা যেটা দেখে তার মনে হয়– এই জিনিসটা পৃথিবীতে একমাত্র তার জন্যই তৈরি হয়েছে। বিন্তিকেও বললেন না অরুণিমা তার এই অদ্ভুত অনুভূতির কথা। পিসিদের দেয়া উপহার পেয়ে বিন্তিরা সবাই খুব খুশি।

সেই বছরটাই ছিল অরুণিমার জীবনে এই অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি হবার শুরুর বছর। এরপর সময় বয়ে যায়। পড়ালেখা আর পড়ালেখা। অরুণিমা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ঠিকই কিন্তু তার অনুভূতি সরে যায় না। এরপরও ছোটো পিসিকে নিয়ে বড়ো পিসির সাথে অরুণিমা গেছেন সেই শহরে। কিন্তু মেলেনি সেই জিনিস। শুধু মিলেছে অনুভূতির বেড়ে যাবার প্রবলতা। নদীর ভাঙ্গন দ্যাখেননি অরুণিমা। কিন্তু এই শহরে এলেই অরুণিমার হৃদয়ে শুরু হয়ে যায় পদ্মা নদীর প্রলয়ংকরী ভাঙ্গনের মতো ভাঙ্গনের কষ্ট। যা তিনি কাউকে বলতে পারেন না। কীভাবে বোঝাবেন? সবাই তাকে পাগল ভাববে। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। অরুণিমা হয়ে ওঠেন ডাক্তার। জীবন থেকে কেটে গেছে কতগুলো বছর। কেটে গেছে কতগুলো বসন্ত। সাবলম্বী হবার পর থেকে গত এতগুলো বছরে সেই একই কলকাতা শহরে তিনি কতবার গেছেন তার কোনো হিসেব নেই। অনেক বন্ধুও তৈরি হয়েছে তার শহরটাতে। তাদের সবাই খুব ঢাকায় আসতে চায়। অরুণিমার কাছ থেকে শোনে ঢাকার গল্প।